তিস্তা পানিবন্টন চুক্তির সম্ভাবনার অপমৃত্যুঃ একটি বিশ্লেষণ

জাহিদুল ইসলাম

ভূমিকাঃ

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান হলো, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে তিস্তার পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হলো না। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পানিসম্পদের জন্য এটি একটি দুঃখজনক ও হতাশাব্যাঞ্জক খবর। তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে গত ৪০ বছর ধরে, গঙ্গাচুক্তি হবার পর থেকে (১৯৯৬ সাল) তা বেগবান হয়েছে বলে ধারনা করা হয়। বিশেষ করে গতবছর (২০১০) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় তিস্তা চুক্তি সম্পাদনের পথে অনেকদূর এগিয়েছিল দুই দেশ। যদিও শেষ মূহুর্তে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি জানান, অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন, বিশেষ করে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনায় অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশের প্রধানমত্রীর ভারত সফরে এ ব্যাপারে কোনো চুক্তি হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই, তবে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে সফরে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হবে । এবছর (২০১১) মনমোহন সিং এর বাংলাদেশে সফরের সময় অবশ্য শেষ পর্যন্তও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তবে তা যে নিছকই দুরাশা ছিল সেটা বলাই বাহুল্য।

তিস্তা চুক্তির প্রয়োজনীয়তাঃ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সেচের ভূমিকা অপরিসীম আর বাংলাদেশে নদীভিত্তিক সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প একটি সফল মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যেখানে দেশের গড় সেচ- আবাদি জমির শতকরা হার ৪২ সেখানে তিস্তা অববাহিকার শতকরা ৬৩ ভাগ আবাদি জমি সেচের আওতাধীন যা মূলত তিস্তা ব্যারেজকে কেন্দ্র করেই । কিন্তু তিস্তায় পানির প্রবাহ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ায় এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের মানুষ। শুরুতে পরিকল্পনায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের দুটি ফেইজ ছিল, যার মধ্যে ফেইজ- ১ সম্পন্ন হয়েছে যা মূলত রংপুর ও নীলফামারী জেলায় সেচের সুবিধা দিচ্ছে। দ্বিতীয় ফেইজে পরিকল্পনা ছিল দিনাজপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও জয়পুরহাটকে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু ভারতের গজলডোবায় ব্যরেজ নির্মানের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশে তিস্তায় পানির প্রবাহ কমে যাওয়াতে সেই পরিকল্পনা এখন হুমকির সম্মুখীন। এই মূহুর্তে তিস্তার পানিবন্টন চুক্তি তাই বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রঃ গুগুল আর্থে গজলডোবা ও তিস্তা ব্যারেজের অবস্থান।

তিস্তা পানিবন্টন চুক্তির আলোচনা, অতীত ও বর্তমানঃ

১৯৭২ সালে আন্তঃসীমান্ত নদীসমুহের উন্নয়নের দিককে সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (জে.আরসি) প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাফল্য হচ্ছে ১৯৮৩ সালে যৌথ নদী কমিশনের ২৫ তম বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারত তিস্তার পানি বন্টনের জন্য একটি এডহক চুক্তি করার বিষয়ে সম্মত হওয়া। সেসময় তিস্তার মোট প্রবাহের ২৫% কে অবন্টনকৃত রেখে বাকী ৭৫% শতাংশ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্টন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল ৩৬:৩৯ (বাংলাদেশঃভারত) অনুপাতে। তবে এই বন্টন কোথায় এবং কি পদ্ধতিতে হবে সেটি নিয়ে দ্বিমতের জের ধরে সেই এডহক চুক্তিটি বাস্তবের দেখা পায়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গাচুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে মূলত তিস্তা পানি বন্টনের আলোচনা বেগবান হলেও দুই দেশের যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রায় সাতটি বৈঠকে মিলিত হবার পরও এই বিষয়ে কোন ঐক্যমতে দুই দেশ পৌঁছাতে পারেনি। সর্বশেষ ৫ জানুয়ারী ২০১০ ভারত বাংলাদেশ যুক্ত নদীকমিশনের দুই দিন ব্যাপী সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষেও তিস্তার বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।এই দীর্ঘ সময়ের আলোচনার ফলেও সফল একটি পানিবন্টন চুক্তিতে না আসার মূল কারন আসলে বাংলাদেশ ও ভারত পানি বণ্টন নিয়ে একটি একক ফর্মুলায় একমত না হতে পারা।

পানিবন্টনের ফর্মুলা নির্ধারনে মূলত কয়েকটি জিনিস চলে আসে। প্রথমতঃ বন্টন নদীর কোন স্থানের প্রবাহের ভিত্তিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ কত বছরের হিস্টরিকাল প্রবাহের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে, তৃতীয়তঃ বন্টনে নদীর নিজস্ব হিস্যা এবং দুই দেশের হিস্যা কত হবে , চুতর্থতঃ পানিবন্টনের সময়কাল কি হবে ইত্যাদি। যৌথ নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত মতে ভারতের দোমোহনী ও বাংলাদেশের ডালিয়াতে প্রবাহ পরিমাপ কেন্দ্রের ১৯৭৩- ১৯৮৫ এই সময়কালে প্রতিবছরের ১ অক্টোবর থেকে পরের বছর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত হিস্টরিকাল প্রবাহের উপাত্ত নিয়ে পানিবন্টন ফর্মূলা নির্ধারণ করা হবে বলে নির্ধারণ করা হয় আর বন্টনের জন্য তিনটি হিস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, প্রথমতঃ নদীর ন্যুনতম প্রবাহ যা কিনা মৎস্য, নৌচলাচলহ সহ নদীখাত সংরক্ষণে রাখা হবে, দ্বিতীয়তঃ ভারতের অংশের হিস্যা, তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ অংশের হিস্যা। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যৌথ নদী কমিশনের সভায় ভারতের গজলডোবায় লব্ধ পানির শতকরা ১০ বা ২০ ভাগ নদীখাত সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ রেখে বাকী অংশ সমভাবে অথবা নিদেনপক্ষে ৩৬:৩৯ (বাংলাদেশঃভারত) অনুপাতে ভাগ করে নেয়ার প্রস্তাব করা হয় যার বিপরীতে ভারত প্রস্তাব করে নদীর জন্য ১০ শতাংশ পানি রেখে বাকী ৯০ শতাংশ পানি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সেচ প্রকল্প এলাকার ভিত্তিতে ১:৫ (বাংলাদেশঃভারত) অনুপাতে বন্টন করার। পরবর্তীতে ভারত দাবী করে যেহেতু ভারতের গজলডোবা থেকে ছেড়ে দেয়া পানি বাংলাদেশের ডালিয়া অংশে পৌঁছবে সুতরাং এই দুইয়ের মাঝখানে নদীখাত সংরক্ষণের জন্য আলাদা করে কোন প্রবাহ বন্টন দরকার নেই। আর বাংলাদেশে তিস্তা নদীর ডালিয়া থেকে ব্রহ্মপুত্রে পড়ার আগ পর্যন্ত নদীখাত সংরক্ষণের জন্য আলাদা কোন হিস্যার দরকার নেই।

বিভিন্ন সময়ের যৌথ নদী কমিশন কিংবা ভারতের রাজনীতিবিদ বা প্রতিনিধিদের বিবৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারত কখনই এই ১:৫ অনুপাত থেকে খুব বেশি সরে আসতে পারেনি। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি ২০১০ সালে পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকার তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে একটি খসড়া তৈরি করে যাতে তিস্তার পানির ৮৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে রেখে ১৭ শতাংশ বাংলাদেশে ছাড়ার পক্ষে মত দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে দুই দেশের ' বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের' (!) ইতিহাস টেনে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী সুভাষ নস্কর ওই খসড়ার নোটে উল্লেখ করেন,

যেহেতু বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেশ, তাই শুকনো মৌসুমে তিস্তার পানির ২৫ শতাংশ বাংলাদেশকে দিলেও রাজ্যের কোনো ক্ষতি নেই ।

একই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে তখন তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরের সবরকম প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে সেই মূহুর্তেও পশ্চিমবঙ্গের মালদহের কংগ্রেস নেতা লোকসভার সদস্য আবু হাসেম খান চৌধুরীর বিবিসিকে বলেন,

...আমাদের বৈঠক হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন আমাকে বলেছেন, (তিস্তায়) যে পরিমাণ পানি থাকবে, তার ৭৫ শতাংশ ভারত নেবে এবং ২৫ শতাংশ বাংলাদেশ পাবে।

তবে এর বিপরীতে আমরা সবসময় আশা করে এসেছি ১৯৯৬ সাল সংঘটিত গঙ্গাচুক্তিকে সামনে রেখে যেখানে অনুচ্ছেদ ৯ উল্লেখ আছে,

পক্ষপাতবিহীন ও সাম্যতাপ্রসূত এবং কোনো পক্ষেরই ক্ষতি না করে দুই সরকারই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহমান অন্যান্য আন্তসীমান্ত নদীসমূহের চুক্তির ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে একমত

এবং এক্ষেত্রে সাম্যতা বজায় রেখে ও শুধু একপক্ষের ক্ষতি সাধন না করে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করা দুই দেশের জন্যই কিছুটা বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে। সেই আঙ্গিকেই মূলত মনমোহন সিং এর বাংলাদেশ সফরের ঠিক ৫ দিন আগে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন তিস্তা চুক্তির খসড়া পানিবন্টনের একটি খবর বের হয় [১০] সেটা নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও আশার মুখ দেখেছিল। ঐ খবরে উল্লেখ করা হয় যে ১৫ বছর মেয়াদী অন্তর্বর্তীকালীন তিস্তা চুক্তি হচ্ছে যাতে ৪৬০ কিউসেক হারে পানির সঞ্চয় রেখে বাকি পানির ৫২ শতাংশ নেবে ভারত, ৪৮ শতাংশ পাবে বাংলাদেশ। এই ' ৪৬০ কিউসেক পানি সঞ্চয়' বিষয়টি ঠিক পরিষ্কার ছিলনা তবে ধারনা করে নেয়া হয়েছিল যে এই ৪৬০ কিউসেক পানি নদীখাত সংরক্ষণে নির্ধারিত থাকবে, অর্থাৎ এই পরিমান পানি নদীতে সবসময় প্রবাহমান রেখে বাকী পানি ৪৮:৫২ অনুপাতে বন্টন করে নেয়া হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই বন্টন চুক্তি নিয়ে আমার ব্যাক্তিগত মত ছিল যে, এই ৪৬০ কিউসেক পানি যদি ভারতে ' সঞ্চয়' হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা আছে কারন তিস্তায় শুষ্ক মৌসুমে ন্যুনতম প্রবাহ ৪৬০ থেকে অনেক কম। আর যদি তা নদীখাত সংরক্ষণের (মূলত জলজ বাস্তুসংস্তান) জন্য হয় তবে তা ইতিবাচক কারন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিস্তা চুক্তির আলোচনায় সবসময়ই শতকরা ২০ ভাগ বা ন্যুনতম শতকরা ১০ ভাগ পানি নদীখাতের জন্য বরাদ্দ রাখার দাবী ছিল সবসময়। তবে উল্লেখ্য যে তিস্তায় শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বেশ কম এবং অনেক সময় তা এই ৪৬০ কিউসেক এর চেয়েও কম। সুতরাং আশঙ্কা ছিল এই ভেবে যে,
প্রথমতঃ ভারত যেখানে শতকরা ১০ ভাগ পানিই নদীখাত সংরক্ষণে বরাদ্ধ রাখতে যায়না সেখানে শুষ্ক মৌসুমে ন্যুনতম প্রবাহের সময় পুরো পানিই নদীখাত সংরক্ষণে বরাদ্ধ করছে সেটা ঠিক বিশ্বাস করা যায়না।
দ্বিতীয়তঃ এই ৪৬০ কিউসেক প্রবাহ কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে সেটাও ঠিক বোধগম্য ছিলনা।

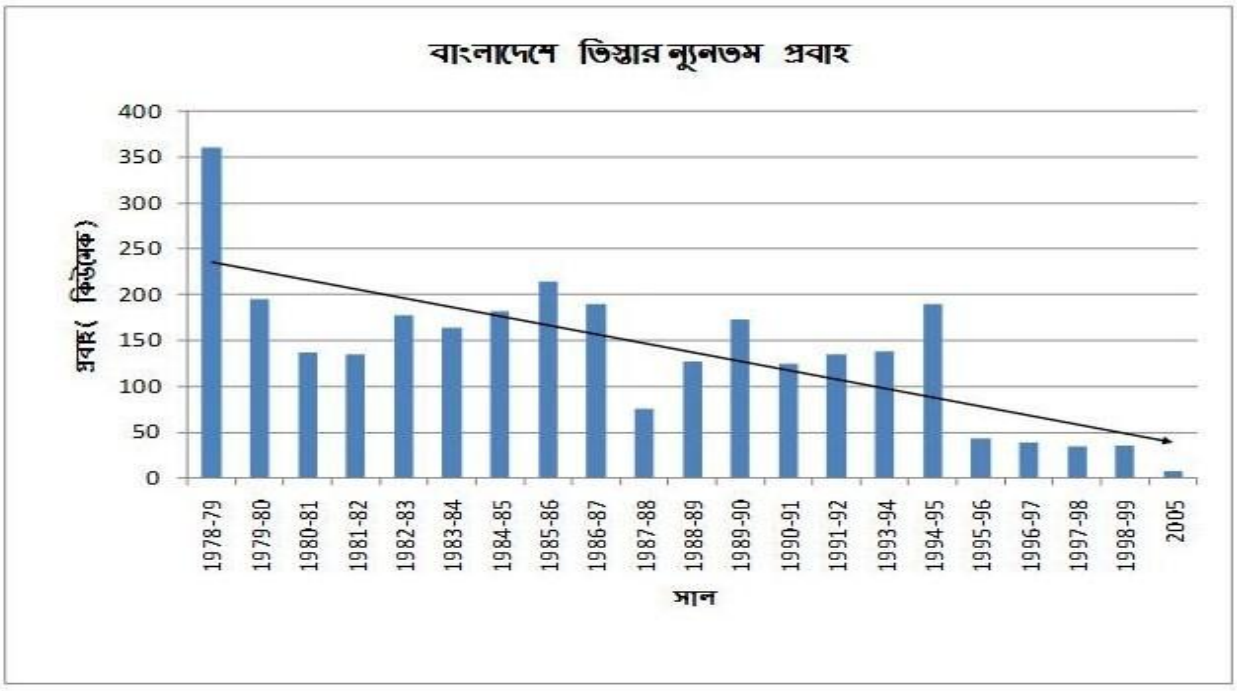

চিত্রঃ বাংলাদেশে তিস্তার ন্যুনতম প্রবাহ (উপাত্ত সুত্রঃবাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

তিস্তা পানিবন্টন চুক্তির সম্ভাবনার অপমৃত্য

বাস্তবতা হচ্ছে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, যার মানে দাঁড়ায় আমাদেরকে আবারো নির্ভর করতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দয়ার উপর। রাজনৈতিক কাঁটাতারের ফাঁদে পড়ে সীমান্তের ঐ পারে গজলডোবায় কৃষানীর দূয়ার ধানে ভরে যাবে আর বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে মঙ্গাপীড়িত মানুষ একমুঠো ভাতের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে।কেন শেষ মূহুর্তে এসে চুক্তিটি হলোনা সেটা পর্যালোচনার দাবী রাখে। আমি চেষ্টা করেছি দুটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতেঃ

ভারতের অবস্থানঃ

পানিবন্টন একটি কারিগরী বিষয় যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।জাতিসঙ্ঘের কনভেনশন মতে একটি পানিবন্টন চুক্তিতে প্রথমত লক্ষ্য রাখা উচিৎ যেন বন্টন এমন না হয় তা কোনপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সাথে বন্টন এমন ভাবে করা উচিৎ যেন তা দুই দেশের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত হয়। এখানেই মূল বিপত্তি এসে দাঁড়ায় আর তা হলো 'কোন ক্ষতি না করা' আর সমভাবে বন্টন কিভাবে একসাথে সিদ্ধ করা যায়। নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজস্ব লাভ বা ক্ষতি নিয়ে সচেতন থাকে। অনেক সময় দেখা যায় সমান ভাবে বন্টন করলে কোন দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় আবার অসমভাবে বন্টন করলে অন্য দেশটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই এক্ষেত্রে শেয়ার্ড স্যাক্রিফাইস বিবেচনা করা হয় যেখানে দুই দেশই তার কিছুটা স্বার্থ ছাড় দেবে একটি সফল বন্টন ফর্মুলার জন্য। অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে এক বা দুই দিনের আলোচনায় এই বন্টন ফর্মূলা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নিয়েই পারি যে যেহেতু দুই দেশই জোর দিয়ে বলেছে ২০১১ তে মনমোহন সিং এর ঢাকা সফরে তিস্তা চুক্তি হচ্ছে সুতরাং এই বন্টন ফমূলা নিয়ে দুই দেশের রাজনীতিবিদেরা আলোচনা করেই একমত হয়েছে এবং একথাও বলার অপেক্ষা রাখেনা যে যৌথ নদী কমিশনের পানি বিশেষজ্ঞরা তিস্তার ঐতিহাসিক প্রবাহ কারিগরী ভাবে বিশ্লেষণ করেই একমত হয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কেন সফরের এক দিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী বেকে বসবেন। সেটা হতে পারে কয়েকটি কারনেঃ

- একঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী বিশেষজ্ঞদের তৈরী করা বন্টন ফর্মুলা মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি যখন তার রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন মনে করেছেন যে এই চুক্তিতে তার রাজ্যের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে।
- দুইঃ কেন্দ্রীয় সরকার বন্টন ফর্মুলা নিয়ে মমতা ব্যানার্জীকে অবগত করেননি এবং ধরেই নিয়েছেন যে কেন্দ্র যা সিদ্ধান্ত নেবে তা রাজ্য সরকার মেনে নেবে।
- তিনঃ ইতিপূর্বে জোতিবসুর নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট সরকার গঙ্গা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যা কিনা রাজ্যের জন্য অনুকূল হয়নি বলে ধারণা করা হয় এবং সাম্প্রতিক কমিউনিষ্ট সরকারের পতন ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ের কারনে মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের স্বার্থবিরুদ্ধ বা সম্ভাব্য স্বার্থবিরুদ্ধ কোন চুক্তি করতে ভয় পাচ্ছেন।
- চারঃ বন্টন ফর্মুলার কারিগরী দিকগুলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে পরিষ্কার করা হয়নি।

প্রথম সম্ভাবনাকে ব্যাবচ্ছেদ করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের নিজেদের মধ্যে সমঝোতার অভাব আমাদের চোখে পড়ে। মমতা ব্যানার্জী যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেয়া পানিবন্টন মেনেই নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্র আগে থেকেই সেটি তার মন্ত্রীপরিষদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ ছিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে সামনে আনলে কেন্দ্র সরকারের সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের সমঝোতার অভাব চোখে পড়ে। কেন্দ্র সরকার এই চুক্তি চুড়ান্তকরনের পানিবন্টন আলোচনায় রাজ্য সরকারকে যদি অন্ধকারে রেখে থাকে তবে ভবিষ্যতেও তিস্তা চুক্তি সম্পাদনের কালক্ষেপণ আরো বাড়বে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মতামত বিশ্লেষণ করে অবশ্য এই সম্ভাবনাকে বেশ প্রবল বলে মনে হয়। তৃতীয় সম্ভাবনাটি একান্তই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তবে তাদের এই অবস্থান তাদেরকে কতটা জনপ্রিয় করবে সেটি সময়ই বলে দেবে।

চতুর্থ সম্ভাবনাটি আসলে চিরাচরিত, বিশেষত আমাদের উপমহাদেশে। কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবস্থানগত দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করে। বন্টন ফর্মুলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোন পয়েন্টের প্রবাহের সাপেক্ষে বন্টন করা

হবে এবং কোন পয়েন্টের প্রবাহ মেপে সেটা দুই দেশ বুঝে নেবে। উদাহরন সরূপ গঙ্গা চুক্তির প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করলে দেখা যায়,

- অনুচ্ছেদ ১- ভারত বাংলাদেশকে চুক্তিতে যে পরিমান পানির প্রদানের বিষয়ে মতৈক্য উপনীত হয়েছে তা নির্ভর করবে 'ফারাক্কায় পানির প্রবাহের উপর'।
- অনুচ্ছেদ ৩- ভারত কতৃক 'অনুচ্ছেদ ১' অনুসারে ফারাক্কা থেকে বাংলাদেশে ছেড়ে দেয়া পানি ফারাক্কা ও যে স্থানে গঙ্গার উভয় পাড়ই বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই দুই এর মাঝখানে যুক্তিসংগত ব্যবহার ব্যাতিরেকে(সর্বোচ্চ ২০০ কিউসেক) আর কমানো হবেনা।

অর্থাৎ কিনা ভারতের ফারাক্কায় ব্যারেজের উজানে যে পরিমান প্রবাহ রেকর্ড করা হবে তার ভিত্তিতেই বন্টন ফর্মুলা ব্যবহার করে দুই দেশের হিস্যা নির্ধারিত হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের হিস্যা, যা আরো কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে বাংলাদেশে পৌছবে সে অংশের উপরে ভারতের তেমন কোন অধিকার (সর্বোচ্চ ২০০ কিউসেক) থাকবেনা। এখানে উল্লেখ্য যে ফারাক্কা থেকে বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এই অংশে নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে এই অংশের অববাহিকা থেকে ওভারল্যান্ড ফ্লো (বৃষ্টির কারনে যে প্রবাহ নদীতে আসে) ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহের মাধ্যমে। যদিও ঐ চুক্তিতে এই বর্ধিত প্রবাহের পরিমান কি হতে পারে তা নিয়ে কোন তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। গঙ্গা চুক্তির ধারাবাহিকতায় তিস্তার ক্ষেত্রেও পানিবন্টন ফর্মুলা কার্যকর হবার কথা ভারতের গজলডোবা পয়েন্টে। অর্থাৎ গজলডোবা ব্যারেজের ঠিক উজানে যে পরিমান প্রবাহ রেকর্ড হবে তার ভিত্তিতেই দুই দেশের হিস্যা নির্ধারণ করা উচিৎ এবং সেই হিস্যা বুঝে নেয়া উচিৎ গজলডোবা পয়েন্টেই এবং তা যথাযথ ভাবে আসছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে নেয়া উচিৎ বাংলাদেশের ডালিয়া পয়েন্টে। উল্লেখ্য যে এই দুই পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার এবং এই দূরত্বের মধ্যে ওভারল্যান্ড ফ্লো ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহের মাধ্যমে তিস্তাতে কতটুকু প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে সেটাও ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল।

আমার ব্যাক্তিগত অভিমত এই চুক্তি থেকে শেষ মূহুর্তে সরে আসার কারন যৌথভাবে প্রথম ও চতুর্থ সম্ভাবনা।তবে যে কারনেই হোক পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকার যখন এই চুক্তি সম্পাদনে বেকে বসেছিল তখন কেন্দ্র সরকারের কিছু করার ছিলনা কারন ভারতে স্ব স্ব রাজ্যের পানিসম্পদ সেই রাজ্যের সম্পদ বলে গণ্য হয়।

বাংলাদেশের অবস্থানঃ

তিস্তা চুক্তিকে ঘিরে ভারতের অবস্থান যতটা রহস্যজনক (বিশেষত মমতা ব্যানার্জীর সরে আসা) তার চেয়েও বেশি রহস্যজনক মনে হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। জনগন একটি সরকারকে নির্বাচিত করে তার প্রতিনিধি হিসেবে অথচ এই ইস্যু নিয়ে সবচেয়ে বেশি অন্ধকারে থেকেছে জনগণ। গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেলের (আদৌ আছে কিনা জানিনা) কোন ব্যাখ্যা, এমনকি পানিসম্পদ মন্ত্রীর কোন বিবৃতিও আমাদের চোখে পড়েনি। ঠিক কি ফর্মুলায় পানিবন্টন করা হচ্ছে, এবং কোন পয়েন্টের প্রবাহের ভিত্তিতে তা করা হচ্ছে সেটি অনুমান করার জন্যও আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সংবাদের দিকে। তারা যখন বলেছে ৪৮:৫২ তখন আমরা আশাবাদ ব্যাক্ত করেছি, তারা যখন জানিয়েছে ২৫:৭৫ তখন আমরা হতাশ হয়েছি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আসন্ন চুক্তি সম্পর্কে জনমত তো দূরের কথা, কোন রকম আলোচনা পর্যালোচনা করারা সুযোগ আমাদের ছিলনা। আগেই বলেছি পানিবন্টন চুক্তি একাধারে কারিগরী ও রাজনৈতিক। আমার মতে এই সম্ভাব্য চুক্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব যতটা ছিল কারিগরী বিশেষজ্ঞদের মতামত কিংবা অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন ততটা ছিলনা।

এই মূহুর্তে বাংলাদেশের কি করনীয়ঃ

প্রথমতঃ খসড়া চুক্তিতে কি ছিল সেটা জনগনের কাছে উন্মুক্ত করা উচিৎ। অন্তত সরকার যে দেশের স্বার্থ রক্ষায় এই পানিবন্টন চুক্তি করতে যাচ্ছিল সেটা সরকারের নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে হলেও প্রকাশ করা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া। ঠিক কি কারনে তিস্তাচুক্তি সম্পাদন সম্ভব হলোনা তার অনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ সরকার আশা করতে পারে। সেই সাথে বাংলাদেশের সাধারণ জনগনের কাছে ও সংসদে সেই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা উচিৎ।

তৃতীয়তঃ ভারতের ব্যাখ্যা যদি যৌক্তিক না হয় এবং শীঘ্রই যদি পূনরায় এই চুক্তি সম্পাদনের কোন সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে গঙ্গাচুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ (' পক্ষপাতবিহীন ও সাম্যতাপ্রসূত এবং কোনো পক্ষেরই ক্ষতি না করে দুই সরকারই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহমান অন্যান্য আন্তসীমান্ত নদীসমূহের চুক্তির ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে একমত') উল্লেখ করে দুই দেশের কাছে এই চুক্তি সম্পাদন যে কিছুটা হলেও বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে সেটা ভারতের কাছে পরিষ্কার করা উচিৎ।

লেখক সম্পর্কেঃ
পড়াশুনা এবং শিক্ষকতা করেছেন বুয়েটে, পানিসম্পদ কৌশল বিভাগে। এখন পানিসম্পদ কৌশল নিয়ে পিএইচডি করছেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টাতে।